Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 312 – 317
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে জনপ্রিয় আখ্যান

রাহুল বর
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : rahulbarasat555@gmail.com

Keyword
জনপ্রিয় আখ্যান, ঐতিহাসিক উপন্যাস, রোমান্স, রূপকথা, সংগঠনবাদ, দিবাস্বপ্ন, কাথারসিস।

Abstract
আলোচ্য গবেষণামূলক নিবন্ধে জনপ্রিয় আখ্যানের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তত্ত্ব আলোচনা এবং তার ভিত্তিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপন্যাসটি নির্মাণের ক্ষেত্রে লেখক আমাদের চারপাশে প্রচলিত রূপকথার ছাঁচকে ব্যবহার করেছেন। রূপকথায় যেমন বিভিন্ন আকস্মিক ঘটনা কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, আমাদের আলোচ্য উপন্যাসেও তেমনই কতকগুলি আকস্মিক ঘটনা কাহিনির নির্মানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও এই কাহিনিতে প্রাধান্য পেয়েছে 'ধর্মীয় সুড়সুড়ি' এবং মানসিক ইচ্ছেপূরণ যা, উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

Discussion
জনপ্রিয় আখ্যান মূলত পুঁজিবাদ পরবর্তী একটি ধারণা। শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে সমাজ ব্যবস্থায় যে আমূল পরিবর্তন ঘটে, তার ফলে সৃষ্টি হতে থাকে এক ধরনের আখ্যান যেখানে, তৃপ্তিটাই মুখ্য। জনপ্রিয় আখ্যান-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> "Popular fiction is frequently thought of as those books that everyone reads, usually imagined as a league table of bestsellers whose aggregate figures dramatically illustrate an impressive ability to reach across wide social and cultural divisions with remarkable commercial success."[১]

জন ও প্রিয় এই শব্দদুটির সমন্বয়ে জনপ্রিয় শব্দের সৃষ্টি হলেও, শব্দটিকে বহু জনের প্রিয় এই অর্থে ব্যবহার করতে চাইনা। একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ কিছু মানুষের প্রিয়— এই অর্থে আমরা জনপ্রিয় শব্দটিকে গ্রহণ করব। জনপ্রিয় আখ্যান এই ভাবে একটি গোষ্ঠীর মানুষের চাহিদা পূরণ করতে থাকে। একটি আখ্যান তখনই জনপ্রিয় হয় যখন পাঠক তার চেনা ঘটনার মুখোমুখি হয়। জনপ্রিয় আখ্যান আসলে দিবাস্বপ্নের মত। আমাদের মনের গোপন আকাঙ্ক্ষা, যা আমাদের 'ইগো' এবং 'সুপার ইগো' দ্বারা অবদমিত হয়, প্রকাশ্যে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হয়; স্বপ্নের মাধ্যমে

সেই অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলিই ভেসে উঠতে চেষ্টা করে। স্বপ্নে আমাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও দিবাস্বপ্ন আমরা আমাদের ইচ্ছেমতো বানিয়ে নিতে পারি। ব্যক্তি বর্তমানের অপ্রাপ্তি, সংকট থেকে ক্ষণিক মুক্তি লাভের আশায়, সংকটহীন এক কাল্পনিক ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে তার দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে। জনপ্রিয় আখ্যান এমনই এক দিবাস্বপ্নের দ্বারা নির্মিত হয়। তা আসলে হয়ে ওঠে এক ইচ্ছেপূরণের গল্প। বর্তমানের অনিশ্চয়তা, বিপদ, শঙ্কা থেকে বাঁচার জন্য; অবদমিত আকাঙ্ক্ষার পরিনিবৃত্তির জন্য ব্যক্তি দিবাস্বপ্ন রচনা করতে থাকে। বাস্তব জগতে যে অপ্রাপ্তি, যে আকাঙ্ক্ষার পরিনিবৃত্তি তার পক্ষে অসম্ভব; পরাজয়ের গ্লানি যেখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে; সেই সমস্ত কিছু থেকে পরিতৃপ্তির জন্য সে হাতে তুলে নেয় সেইসব আখ্যান, উপভোগ করে সেইসব চলচ্চিত্র, নাটক, সঙ্গীত যেখানে মানসিক দিক থেকে তার ইচ্ছেপূরণ ঘটে। আর এই ইচ্ছেপূরণই একটি পাঠকে জনপ্রিয় করে তোলে। বাস্তব জগতে বিপদগ্রস্ত পাঠক যখন দেখে আখ্যানের কোনও চরিত্র সেই একই বিপদের মধ্যে রয়েছে, তখন তাদের মধ্যেকার 'ইগো' মিলিয়ে যেতে থাকে। তখন পাঠক আখ্যানের চরিত্রের সাথে নিজেকে মিলিয়ে নেয়। পাঠক মনে করতে থাকে এই যাতনাটা কেবল তার একার। যেন, তার একার জন্যই এই উপন্যাসটি রচিত। আর যখন আখ্যানের সেই চরিত্রটি একক দক্ষতায়, অলৌকিক উপায়ে, সমস্ত রকম সামাজিক সংকট, প্রতিকূলতার অবসান ঘটিয়ে মুক্তিলাভে সক্ষম হয়, তা পাঠের মাধ্যমে পাঠক পরিতৃপ্তি লাভ করে। যেন সে নিজেই বাস্তবের সমস্ত প্রতিকূলতার অবসান ঘটাল। আর আখ্যানের চরিত্রটির যাতনাই যদি মুখ্য হয়, যদি সে প্রতিকূলতার অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হয়, তাতেও আখ্যানটি জনপ্রিয় হয়। পাঠক চরিত্রটির প্রতিকূলতাকে যখন নিজেরই সংকট বলে মনে করতে থাকে, তখন সে ওই যাতনাকে ভালোবাসে। সেক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল (৩৮৪ খ্রি.পূ. ৩২২ খ্রি.পূ.) কথিত 'কাথারসিস' এর প্রয়োগ ঘটে। অপ্রাপ্তি, ব্যর্থতাকে মোহময় করে তোলা হয় সেখানে। ফলে, যা পাঠকের কাছে বেদনাময় বলে মনে হচ্ছিল, তার নিরসন হতে থাকে।

আমরা বিশ্লেষণ করলে দেখব, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০ খ্রি.)-এর 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' (১৯৬৫ খ্রি.) এমনই এক ইচ্ছে পূরণের গল্প।

> "রূপকথায় যেমন ইচ্ছাপূরণ ঘটে, শরদিন্দুও তেমনি ইতিহাস ও কল্পনার অন্তর্বর্তী জলবিভাজন রেখাটি মুছে দিয়েছেন।"[২]

ভ্লাদিমির প্রপ (১৮৯৫-১৯৭০ খ্রি.) তাঁর 'মরফোলজি অফ দ্য ফকটেল' (১৯২৮ খ্রি.) গ্রন্থে রূপকথার গল্পে একত্রিশটা ক্রিয়াশীলতা (functions)-র উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, রূপকথার গল্পে বেশ কিছু ক্রিয়াশীলতা থাকে যেগুলি গল্পের ভবিষ্যৎ গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতাগুলি গল্পে বাঁকের মতো কাজ করে, গল্পটির বিশেষত্ব নির্মাণ করে। আমরা আমাদের আলোচ্য 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করলে দেখব এমনই কতগুলি ঘটনা পাই, যা আমাদের কাছে আকস্মিক বলে মনে হয়। এই আকস্মিক ঘটনাগুলিই কাহিনিতে বাঁকের কাজ করেছে— আখ্যানের জট পাকাতে অথবা তা ছাড়াতে সাহায্য করে। উপন্যাসটির কাহিনিবৃত্ত নির্মিত হয়েছে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগকে কেন্দ্র করে। প্রথম পর্বের নবম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, ঠিক যে সময়ে নৌকোগুলি বিজয়নগরে নদীর কিল্লাঘাটে পৌঁছবার উপক্রম করছে, ঠিক সেই সময়েই কথকের সুচারু চালে উপস্থিত হল ঝড়—

> "দাক্ষিণাত্যের শৈলবন্ধুর মালভূমিতে গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে এমনই অকর্কিতে ঝড় আসে। ...ঝড় বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না...কিন্তু তাহার যাত্রাপথে যাহা কিছু পায় সমস্ত ছারখার করিয়া দিয়া চলিয়া যায়।"[৩]

ঝড়ের প্রকোপে অর্জুনবর্মা, বিদ্যুন্মালা দুজনেই নদীতে পড়ে গেলে অর্জুনবর্মাই রাজকুমারীকে উদ্ধার করে নদী সংলগ্ন দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই নির্জন দ্বীপে রাত্রি যাপন বিদ্যুন্মালা এবং ঈষৎ অর্থে অর্জুনবর্মাকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ করে দেয়। অপরদিকে মহারাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার কম্পনদেব অর্জুনবর্মা - বিদ্যুন্মালার নির্জন দ্বীপে রাত্রিবাসের খবর মহারাজের কাছে পৌঁছে দেয়, রাজগুরু কূর্মদেবের পরামর্শে বিবাহ তিন মাস

স্থগিত থাকে। আমাদের বক্তব্য, প্রাকৃতিক বিপর্যয় যদি না ঘটত, তাহলে অর্জুনবর্মা - বিদ্যুন্মালার পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্রটির প্রস্তুত হত না। আবার, তাদের নির্জন দ্বীপে একত্রে অবস্থানের দৃশ্য যদি কম্পনদেব দেখে না ফেলত, তাহলে বিবাহ তিন মাস স্থগিত হত না। উক্ত ঘটনাগুলি উপন্যাসের পরবর্তী জটিলতা সৃষ্টিতে, সংকট নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। যদি ঘটনাগুলি না ঘটত, তাহলে রাজা দ্বিতীয় দেববায়ের সাথে বিদ্যুন্মালার বিবাহ হয়ে যেত। ফলে আখ্যানটির প্লট অন্যভাবে নির্মিত হত।

দ্বিতীয় পর্বের ষষ্ঠ দৃশ্যে আবারও তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় আকস্মিকভাবেই। রাজগুরুর আদেশে পম্পাপতির মন্দিরে পূজা দিতে যাওয়ার জন্য বিদ্যুন্মালা রাজবাড়ির বাইরে আসে, ঠিক সেই সময়েই অর্জুনবর্মাও অতিথি-ভবন থেকে বাইরে এসে রাজকন্যাকে দেখতে পায়। পরেরদিনও একই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায়,

> "বিদ্যুন্মালার গণ্ডে কাঁচা সিঁদুর ছড়াইয়া পড়িল"[৪]
> "...তার হৃৎপিণ্ড ক্ষণিকের জন্য দুরু দুরু করিয়া উঠিয়াছে।"[৫]

অর্জুন বর্মার মনও ক্ষণিকের জন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এই আকস্মিকতার অবতারণার মাধ্যমে কথক উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মধ্যেকার প্রেমে জলসিঞ্চন করলেন, তাদের প্রেমকে খানিকটা গাঢ় করে তুললেন।

কম্পনদেবের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে মহারাজের অনুপস্থিতি আরও এক আকস্মিকতা। মন্ত্রী লক্ষ্মণ মল্লপ দ্বিতীয় দেবরায়কে সাবধান করে দিলেও, মহারাজ তাতে কর্ণপাত করেনি। তার যুক্তি,

> "কম্পন আমাকে ভালবাসে। সে আমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে আমি ভাবতেও পারি না। তাছাড়া আমার অনিষ্ট করবার ক্ষমতা তার নেই।"[৬]

নিজের ভাইয়ের প্রতি যার এই অগাধ বিশ্বাস, তার নিমন্ত্রণ রক্ষা না করার কারণ স্পষ্ট ভাবে বলা নেই উপন্যাসে। এমনকি কম্পনদেব যখন মহারাজকে হত্যা করবার জন্য তার বিশ্রামকক্ষে উপস্থিত হয়, সেই সময় অর্জুনবর্মাও অস্ত্র হাতে সেখানে উপস্থিত থাকে। যেন, রাজাকে রক্ষা করবার জন্য কথক সেখানে অর্জুনবর্মাকে রেখে দেন। কারণ মহারাজের প্রাণনাশ এই আখ্যানের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে বাধ্য। দ্বিতীয় দেবরায়ের ভাই হিসেবে কুমার কম্পনদেবের নাম ইতিহাস সমর্থিত নয়। তাই তার রাজাকে আক্রমণের ঘটনাও কথক কল্পিত বলেই মনে হয়। তবে দ্বিতীয় দেবরায়ের এক ভাই রাজা, রাজপুত্র এবং রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে উপস্থিত ব্যক্তিদের হত্যা করেছিলেন; রাজাকে ছুরিকাঘাত দ্বারা হত্যার চেষ্টা চালিয়েছিলেন— এই ঘটনা ইতিহাস স্বীকৃত। কিন্তু কথক যেভাবে নিজের কল্পনা শক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে ঘটনাটির নবনির্মাণ করেছেন তা মূল ঘটনার তুলনায় অনেক বেশি সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

নির্বাসিত অর্জুনবর্মা বলরামের সাথে যে সময়ে বিজয়নগরের সীমান্তবর্তী পর্বতের গুহামুখে আশ্রয় নিল, ঠিক সেই সময়ই, ওই গুহারই অপরপ্রান্তে বাহমনী সৈন্যরা বিজয়নগরে প্রবেশের উপক্রম করতে থাকে। এই আকস্মিক সমাপতনে অর্জুনবর্মা-বলরামের তৎপরতায় বাহমনী সৈন্যদের বিজয়নগর অভিজান ব্যর্থ হয়, তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। অর্জুনবর্মাও 'দেশভক্তির চূড়ান্ত পরিচয়' দেওয়ার সুযোগ পায়। বলা ভালো, কথাকার সুযোগ করিয়ে দেন। এই দেশভক্তি প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য –

> "দেশব্রতে ত্যাগকে মধ্যবিত্ত বাঙালি একদা বড় স্থান দিয়েছিল। ...বিশ শতকের দশকগুলি ধরে এ আদর্শ গৌরবের শিখর স্পর্শ করেছিল। শরদিন্দু দেশব্রতের সেই আদর্শ তুলে আনলেন অর্জুন বর্মার চরিত্রে।"[৭]

এই আকস্মিকতার ঘনঘটা, যেগুলির উপস্থিতি উপন্যাসটির জটিলতা বৃদ্ধি অথবা তা নিরসনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে— এটা শরদিন্দুর উপন্যাসে নতুন কিছু নয়। তাঁর 'কালের মন্দিরা' (১৯৫১ খ্রি.) থেকে শুরু করে 'তুঙ্গভদ্রার

তীরে' পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলি দাঁড়িয়ে আছে এমনই আকস্মিকতার উপরে। এই আকস্মিক ঘটনাগুলি সরিয়ে দিলে আখ্যানের কাহিনি অন্যরকম হয়ে যেত, কাহিনির টানটান উত্তেজনাও হয়ত শিথিল হয়ে যেত। কালের মন্দিরায় তিলক বর্মা ওরফে চিত্রক-এর সাথে শশিশেখর-এর সাক্ষাৎ, তার আত্মপরিচয় প্রকাশ সমস্ত কিছুই আকস্মিকতার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। সমালোচকের মন্তব্য –

> "গোটা উপন্যাস কাল্পনিক কাহিনি ও চরিত্রে পরিপূর্ণ। ...এই কাহিনি রূপকথায় পর্যবচিত হতো যদি না সেই সময়ের ইতিহাস পটভূমিকায় লেখক উপস্থিত করতেন।"[৮]

কালিদাসের সম্বন্ধে যেহেতু ঐতিহাসিক তথ্যের একান্তই অভাব, সেহেতু 'কুমার সম্ভবের কবি' (১৯৬৩ খ্রি.) রচনার জন্য লেখককে জনশ্রুতি, কিংবদন্তির উপরই নির্ভরশীল হতে হয়। সেক্ষেত্রে আকস্মিকতা অনিবার্যভাবেই চলে আসে। কিন্তু শরদিন্দুর কৃতিত্ব এই যে, এই একটাও ঘটনাকে আমাদের আকস্মিক বলে মনে হয় না। উপন্যাসটি প্রসঙ্গে হরেকৃষ্ণ মুখপাধ্যায় একটি চিঠিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন, "তোমার লেখায় একটা জাদু আছে, তুমি অনায়াসে এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি কর যে পলকে মনকে সুদূর অতীতে টানিয়া লও"। (৪ আষাঢ়, ১৯৭৩) মনে হয় যেন ঘটনাগুলি ইতিহাসেরই অংশ, সেগুলি ইতিহাসের একটা কালপর্বে ঘটেছে। কিন্তু উপরিউক্ত কোনও ঘটনাই অনিবার্যভাবে ইতিহাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা কাহিনি নয়। তা কথকের কল্পিত অথবা নব নির্মিত। অথচ, এই ঘটনাগুলিই কাহিনি নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আখ্যানটিতে বেশ কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যবহার করা হলেও, তার প্লট সুচারুভাবে খানিকটা আকস্মিকতার উপর নির্ভরশীল, যেগুলি ইতিহাস সমর্থিত নয়।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলির প্রেক্ষাপট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দু ভারতবর্ষ। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'-র ঘটনাকাল ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দের আশেপাশে (১৩৫২ শকাব্দ), অর্থাৎ ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের বিস্তারের কাল। আর উপন্যাসটির রচনাকাল বিশ শতকের ছয়ের দশক, যে সময়ে ভারত পাকিস্তানের সীমান্তকেন্দ্রিক উত্তেজনা, রেষারেষি চলছে। সমালোচকের মন্তব্য –

> "শরদিন্দু সজ্ঞানে হিন্দু মুসলমান নিয়ে বহু অনুসন্ধান ও চিন্তাভাবনা করেছেন। ভারত-পাক বিবাদ ও ভারতে মুসলিম বিজয়কে জাতির জীবনে একটা বিরাট দুর্যোগ বলে মনে করতেন।"[৯]

তাই আমরা বলতে পারি, উপন্যাসটি রচনার উদ্দেশ্য হিন্দু সাম্রাজ্যের উপর যবনদের আক্রমণ ও তাদের অত্যাচার বর্ণনার পাশাপাশি হিন্দুর রাজ্য বিজয়নগরের শৌর্য, বীরত্বকে প্রতিষ্ঠা।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনশৈলী অসামান্য। ভাষার অন্তর্বয়ানে - চমৎকার মুহূর্ত সৃজনে-দৃশ্য রচনার গুণপনায়-সংলাপের মাধুর্যে পাঠক বাস্তবতার বোধ-বুদ্ধি হারায়। অর্জুনবর্মা - বিদ্যুৎমালার মধ্যেকার যে মৃদু টেনশন, আকুতি - উত্তেজনার উপস্থাপনা— তা এমন সুচারুভাবে নির্মিত যে পাঠক তর্কপ্রবণভাবে, সতর্ক হয়ে পাঠ করতে ভুলে যায়। এমনকি, সে নিজেকেই অর্জুনবর্মা বলে কল্পনা করে নিতে থাকে। আর আখ্যানের অর্জুনবর্মা যেন রূপকথার গল্পর 'বুদ্ধু - ভুতুম' শ্রেণির এক চরিত্র। যার দৈহিক গঠন 'বানর'-এর মত, যার মা 'ঘুঁটে কুড়ানি দাসী', অতি কষ্টে যার দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হয়, সেই বুদ্ধুই নাকি রাজার কুমার। বাঁদরের মতো আকৃতি আসলে তার বাহ্যিক খোলস, আসলে সে 'দেবতার পুত্রের মতো সুন্দর'। নিজের শৌর্য - বীর্যের প্রকাশ ঘটিয়ে কলাবতী রাজকন্যাকে সে লাভ করে, তার আসল নাম বুধকুমার। এই ভাবে দিবাস্বপ্নে, কল্পনার জগতে সেই সব ঘটনা সৃষ্টি করা হয়, যেগুলি বাস্তব জগতে ঘটা আপাতত সম্ভব নয়। কল্পনার জগতে তারা সাজে রাজপুত্র। রাজকন্যাকে বিবাহ এবং রাজসিংহাসন লাভ হয় তাদের কল্পনার বিষয়। আমাদের আলোচ্য আখ্যানের অর্জুনবর্মাও যেন রূপকথার পাতা থেকে উঠে আসা এমনই এক চরিত্র। যে অর্জুনবর্মা যবনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রাণ রক্ষার তাগিদে নদীতে ঝাঁপ দেয়, কপর্দকশূন্য অবস্থায় বিজয় নগরে প্রবেশ করে, সেই অর্জুনবর্মার বিবাহ হয় রাজকুমারীর সাথে। রাজসিংহাসন লাভ না করলেও, বিজয় নগরের তুরঙ্গ বাহিনীর সেনানি হিসেবে নিযুক্ত হয় সে। এই একই ধরনের গঠন 'কালের মন্দিরা' উপন্যাসেও

লক্ষণীয়। আসলে জনপ্রিয় আখ্যানের পূর্বনির্দিষ্ট যে ছাঁচ, সেই ছাঁচকে এই ধরনের আখ্যানে বারবার প্রয়োগ করা হয়। কারণ সাধারণ জনগণ এই ধরনের 'পণ্য'-ই ভোগ করতে বেশি পছন্দ করে। কালের মন্দিরার কাহিনিবৃত্ত অনুসরণে দেখা যায়, পিতৃপরিচয়হীন, অজ্ঞাতকুলশীল, যুদ্ধজীবী চিত্রক - অর্থলাভের জন্য যে যুদ্ধ করে, যুদ্ধের কারণে যার সারা দেহে অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন, যুদ্ধ সমাপ্ত হলে ভাগ্যের অন্বেষণে যাকে আবার পথে বেরিয়ে পড়তে হয়, পেশাদার সৈনিক জীবনের অনিশ্চয়তা যাকে বেপরোয়া করে তুলেছে, সেই চিত্রক-ই আসলে রাজপুত্র তিলক বর্মা। কাহিনির পরিসমাপ্তিতে দেখা যায়, নিজের পিতার হৃত রাজ্য ফিরে পায় চিত্রক। অর্থাৎ সে এখন রাজা তিলক বর্মা, রাজকুমারী রাট্টা যশোধারা তার ধর্মপত্নী। রূপকথার ছাঁচে পরিবেশিত এই ধরনের আখ্যানে রোমান্স ও অ্যাডভেঞ্চারের ভক্তপাঠক খুঁজে পায় সাধারণের ভিড় থেকে উঠে আসা এমন এক চরিত্রকে, যার নেই কোনও অর্থবিত্ত, ঐশ্বর্য, প্রভাব - প্রতিপত্তি, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা; যার কপালে নেই রাজতিলক। কিন্তু সততায় - দক্ষতায়, সর্ব অর্থে দেশভক্তি - রাজভক্তিতে সে লাভ করে রাজানুগ্রহ, রাজকন্যা। বিপদগ্রস্ত, সমস্যায় জর্জরীত পাঠক - অপ্রাপ্তিই যার জীবনের মূল প্রাপ্তি, এই চরিত্রটির সাথে সে সম্পূর্ণ একাকার হয়ে যায়। আস্বাদ করে এমনই এক বিচিত্র রস— যা, বাস্তব জগতে চিরকালই অধরা থেকে যায়।

শেষ পর্যন্ত 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' একটি জনপ্রিয় আখ্যান হিসেবে রয়ে যায়, যেখানে রূপকথার গঠনকেই অনুকরণ করা হয়েছে। উচ্চশ্রেণির উপন্যাস সাধারণত আলোচ্য উপন্যাসটির মতো আকস্মিকতার উপরে নির্ভরশীল থাকে না, তার ঘটনাক্রম অনিবার্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে থেকে উঠে আসা ঘটনা নিয়ে তৈরি হয়নি। সেখানে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে রোমান্স রসই প্রাধান্য পেয়েছে। সুকুমার সেন একটি চিঠিতে উপন্যাসটি প্রসঙ্গে শরদিন্দু বাবুকে লেখেন, 'অনেক দিন বাংলা বই পড়িয়া এমন তৃপ্তি পাইনি।' (৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৫) পাঠকের এই তৃপ্তি, তার ইচ্ছে পূরণ এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। ইতিহাস বাঙালি পাঠকের এক আগ্রহের স্থান। সেই ঐতিহাসিক মোহকে কেন্দ্রে রেখে, ঐতিহাসিক পটভূমিতে রোমাঞ্চকর কাহিনির নির্মাণই এর বিশেষত্ব।

তথ্যসূত্র :

১. Glover, David. Scottt McCracken (Ed.). 'The Cambridge Companion to Popolar Fiction'. Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, P. 1
২. নাথ, প্রিয়কান্ত, রামী চক্রবর্তী (সম্পা.), 'বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৬, পৃ. ১৫৫
৩. গুপ্ত, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র (সম্পা.), 'শরদিন্দু অমনিবাস', তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৩, পৃ. ৫১৮ – ৫১৯
৪. তদেব, পৃ. ৫৪৮ - ৫৪৯
৫. তদেব, পৃ. ৫৪৬
৬. তদেব, পৃ. ৫৮৮
৭. রউফ, আবদুর (সম্পা.), 'চতুরঙ্গ পত্রিকা'— বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ১ ও ২, বিজিতকুমার দত্ত: তুঙ্গভদ্রার তীরে, 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য', কলকাতা: গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, পৃ. ১৬
৮. দে, স্বপন কুমার, 'বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের ব্যবহার', কলকাতা, আনন্দ প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ৪৭
৯. গুপ্ত, ক্ষেত্র, 'রমণীয় শরদিন্দু', কলকাতা, গ্রন্থনিলয়, ২০০১, পৃ. ১২৯

গ্রন্থপঞ্জি :

আকরগ্রন্থ :

১. গুপ্ত, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র (সম্পা.), 'শরদিন্দু অমনিবাস', তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৩

সহায়ক গ্রন্থ :

১. গুপ্ত, ক্ষেত্র, 'রমণীয় শরদিন্দু', কলকাতা, গ্রন্থনিলয়, ২০০১
২. দে, স্বপন কুমার, 'বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের ব্যবহার', কলকাতা, আনন্দ প্রকাশন, ২০১৮
৩. নাথ, প্রিয়কান্ত, রামী চক্রবর্তী (সম্পা.), 'বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৬
৪. Propp, Vladimir. 'Morphology of the Folktale'. Austin: University of Texas Press, 2009

সহায়ক প্রবন্ধ :

১. Barthes, Ronald. Lionel Duisit. "An Introduction to the Structural Analysis of Narrative." (Link: http://links.jstor.org/sici?sici=0028-6087%28197524%296%3A2%3C237%3AAITTSA%3E2.0.CO%3B2-3

২. Frued, Sigmund. "Creative Writers and Day-Dreaming." (Link: https://static1.squarespace.com/static/5441df7ee4b02f59465d2869/t/588e9620e6f2e152d3ebcffc/1485739554918/Freud+-+Creative+Writers+and+Day+Dreaming%281%29.pdf

৩. Frued, Sigmund. "The Structure of the Unconscious." (Link: http://webspace.ship.edu/cgboer/freudselection.html